ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
একত্রিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৪/জ্যৈষ্ঠ ১৪১১

বাংলাদেশে আখচাষে সমস্যা ও সম্ভাবনা: কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ এলাকার উপর একটি সমীক্ষা

মোঃ গিয়াস উদ্দিন*
মোঃ সেলিম**

Abstract *: Sugarcane is such a wonderful agri-plant which is not only providing sugar to the people but also every parts of this products are using as raw materials to the various needs of the mankind and is has created a noticeable employment. The significance of the sugarcane is important in lives and bringing up the people. It has also social and cultural value in the society for maintaining harmonious existence in the community. Here, in this article, the history of sugarcane in the sub-continent, production process, usefulness, problems and prospects have been upheld, ended with a suggestion and a guideline for implementation at the end of this article.*

১.০ ভূমিকা

আখ বাংলাদেশের একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। নগদ অর্থ যোগান দিয়ে কৃষকের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠনে এর অবদান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের জলবায়ু এবং মৃত্তিকা আখ চাষের উপযোগী। এ সুবিধার জন্য দেশের সকল অঞ্চলেই কমবেশি আখ চাষ হয়। বন্যা ও খরা-সহিষ্ণু ফসল হিসাবে আখের খ্যাতি রয়েছে (সাত্তার, ২০০৫, পৃ-২৫৯)। বাংলাদেশে আখ চাষের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বর্তমানের উত্তরবঙ্গ প্রাচীনকাল থেকেই আখ এবং চিনি শিল্পের জন্য বিখ্যাত। প্রাক-বৃটিশ আমলে ঐ এলাকা থেকে চিনি রপ্তানী হতো। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে চিনি উৎপাদন হতে থাকে উত্তরবঙ্গে। বহুবিধ সমস্যার কারণে আখচাষ, চিনি ও গুড় শিল্প তার স্বকীয়তা ও উৎকর্ষ বজায় রাখতে পারেনি বলে এদেশে এখন আখ চাষীদের অবস্থা তেমন ভাল নয় এবং চিনি ও গুড় শিল্পে দেখা যাচ্ছে অনগ্রসরতার ছাপ। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, এদেশে জনপ্রতি বার্ষিক ১৩ কেজি চিনি বা ১৭ কেজি গুড়ের প্রয়োজন এবং সেটা মেটানোর জন্য ১৩ লক্ষ টন চিনি বা ১৭ লক্ষ টন গুড়ের প্রয়োজন। কিন্তু সে স্থানে বৎসরে চিনি ও গুড় উৎপাদনের মাত্রা যথাক্রমে মাত্র ১.৮০ ও ৩.০০ লক্ষ টন। যার ফলে প্রতি বৎসর এদেশে চিনি আমদানী করতে হয়। অথচ আখ বিজ্ঞানীদের মতে, এদেশের মাটি ও আবহাওয়া আখ চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ফলন বাড়িয়ে এ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

পৃথিবীতে মানুষ যে পরিমাণ ক্যালোরী বা খাদ্যবল গ্রহণ করে তার এক-অষ্টমাংশের ৬০ ভাগ আসে আখ থেকে উৎপাদিত গুড় ও চিনি হতে। ঈশ্বরদী আখ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা আখের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যেসব পন্থার উপর জোর দিতে চান তা হলো উন্নতজাতের আখ উদ্ভাবন ও ব্যবহার, রোপা আখ চাষ, রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন, দ্রুত বীজ বর্ধন ও ব্যবহার, সুষম সার প্রয়োগ, বিভিন্ন সাথী ফসলের চাষ, পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন, আখের জমিতে গাছের সংখ্যা ঠিক রাখা, সম্পূরক সেচের প্রয়োগ, চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ, ঋণ, উপকরণ ও দাম নিশ্চিতকরণ। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত কয়েকটি গ্রামের ২৫০ জন আখ চাষীদের অবস্থা অবগত হওয়ার মাধ্যমে আখ চাষে তাদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং কিভাবে এ সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা যায় তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

২.০ গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. আখ চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট আখ চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
খ. আখ উৎপাদন প্রক্রিয়া ও আখ চাষের অনগ্রসরতার জন্য দায়ী সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ; এবং
গ. চিহ্নিত সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানকল্পে কার্যকর সুপারিশ প্রদান।

৩.০ গবেষণার যৌক্তিকতা

আখ খাদ্য ও শিল্পে ব্যবহার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। জাতীয় অর্থনীতিতে অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। চিনি উৎপাদন ছাড়াও গুড় উৎপাদন, চিবিয়ে খাওয়া প্রভৃতি কাজে আখের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে গুড় এবং চিনির ব্যবহার এ দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। গ্রামের মানুষের সামাজিকতা, আতিথেয়তা ও আত্মীয়তা প্রভৃতির জন্য গুড়ই একমাত্র ভরসা। কিন্তু গুড় এবং চিনির উচ্চ মূল্যের কারণে এগুলো থেকে যাচ্ছে সাধারণ জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে। বিভিন্ন অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবসম্মত সরকারি নীতির অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের চিনি শিল্প ক্রমান্বয়ে অলাভজনক বিবেচিত হচ্ছে। অথচ এ শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে হাজারো ভাগ্য বিড়ম্বিত দরিদ্র চাষীর জীবন ও জীবিকা। আখ বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল হওয়া সত্ত্বেও এর একর প্রতি ফলন এবং চিনি আহরণের শতকরা হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন। বর্তমানে দেশে মাত্র ০.২ মিলিয়ন টন চিনি এবং ০.৩ মিলিয়ন টন গুড় উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের বর্তমান চিনি ও গুড়ের চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে বিরাট ঘাটতি রয়েছে। ফলে প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমদানী করতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিবেশি দেশ ভারত থেকেও প্রচুর চিনি অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করছে এবং স্থানীয় বাজারগুলো ভারতীয় নিম্নমানের চোরাই চিনি দ্বারা সয়লাব হয়ে আছে। ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশীয় চিনি উৎপাদনকারী চিনি কলগুলো এবং আখের ন্যায্য মূল্যের অভাবে আখ চাষে নিরুৎসাহিত হচ্ছে অসহায় কৃষক সমাজ। সুতরাং আখ চাষে বিরাজমান নানাবিধ সমস্যাগুলোকে পরোক্ষ বা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বরং প্রত্যক্ষ বা অন্তর্দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে প্রকৃত সমস্যাগুলো খুঁজে বের করে এর সমাধানের পন্থা নির্দেশ করতে এ গবেষণা যথেষ্ট যৌক্তিকতা রাখে।

৪.০ গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যের সহযোগিতা নেয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রশ্ন এবং আবদ্ধ প্রশ্নপত্রের আশ্রয় নেয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে সরাসরি কৃষকদের সাক্ষাৎ গ্রহণের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে আখ চাষীদের অবস্থা, মতামত ও মনোভাব যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। মাধ্যমিক তথ্যসমূহ আখের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি অফিস থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত পত্র-পত্রিকা, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন ও বই পুস্তক থেকে সংগৃহীত হয়। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার ৩টি উপজেলার (কুমারখালী, কুষ্টিয়া সদর ও শৈলকুপা) ২৫০ জন আখচাষীর সাক্ষাতকার নেওয়া হয়। তন্মোধ্যে ২০০ জন কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসী আর অবশিষ্ট ৫০ জন ঝিনাইদহ জেলার বাসিন্দা। ২০০২ ইংরেজি সনের জানুয়ারি-মে মাসব্যাপী তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। ২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত তথ্যসংগ্রহকারী পারিবারিকভাবে যাদের আখচাষের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা দীর্ঘ ৫ (পাঁচ) মাস ব্যাপী সুবিধামত সময়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে। তথ্যসংগ্রহের সময় কখনো কখনো গবেষকদ্বয় তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে আখচাষীদের সাথে মত বিনিময় ও আখচাষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া গবেষকদ্বয় আখচাষের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামত গ্রহণ করেছেন।

৫.০ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

তথ্য সংগ্রহের সময় কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেমন- কোন কোন উত্তরদাতাকে একাধিকবার প্রশ্ন সম্বন্ধে ধারণা দিতে হয়েছে এবং অনেক সময় প্রাসঙ্গিক উত্তর না দিয়ে তিনি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। বেশিরভাগ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নতর বিধায় অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে তারা অনীহা প্রকাশ করেছেন। বর্ণিত এলাকার সকল আখচাষীর মতামত যাচাই করতে পারলে গবেষণাকর্মটি পরিপূর্ণতা অর্জন করত। কিন্তু প্রয়োজনীয় সময় ও আর্থিক সীমাবদ্ধতাসহ আরো নানাবিধ কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি বিধায় এ গবেষণায় অনিবার্য কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৬.০ গবেষণা এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জেলাসমূহের অন্যতম। খুলনা বিভাগে অবস্থিত। পদ্মা নদীর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এ জেলা দুটির অবস্থান। এলাকায় নানা প্রকার কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় বিশেষ করে তামাক, পান, কলা, আখ ও শাক-সবজি উৎপাদনের জন্য এ জেলা দু'টি বিখ্যাত। কুষ্টিয়া বাংলাদেশের বৃহৎ জেলাসমূহের একটি হলেও ঝিনাইদহ বৃহত্তর যশোহর জেলার অংশ। কৃষিতে অগ্রসর এ এলাকা এক সময় উন্নত যোগাযোগের অভাবে কৃষি উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবেলা করেছে। তুলনামূলকভাবে বর্তমানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দেশের বৃহত্তর বাজার ব্যবস্থার সাথে এ এলাকার কৃষিজ উৎপাদন বিপণনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। এ এলাকার উৎপাদিত কৃষি পণ্যের অন্যতম হচ্ছে আখ। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের একটি।

নানাবিধ সমস্যার জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে আখচাষ অধিক উৎপাদনে একদিকে যেমন অক্ষম, অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে না পারার কারণে ভূমির সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতাও আয়ত্বের বাইরে। এদুটি জেলার মধ্যবর্তীস্থানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থান করার কারণে এলাকার উপর এর প্রভাব পড়েছে গভীরভাবে। এলাকার জনগণের উৎপাদন, বিপণন, আচার অভ্যাসেও বেশ পরিবর্তন লক্ষণীয়।

৭.০ আখচাষের পটভূমি

আখের উৎপত্তি ও চাষের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, স্বর্গ হতে বিতাড়িত শিষ্য ত্রিশংকর জাগতিক জীবনকে মধুময় করার জন্য মুনি বিশ্বামিত্র আখের উদ্ভব ঘটান। হিন্দু সম্প্রদায় পূজার অর্ঘ্য হিসেবে ডাটা চিবিয়ে দেখে মিষ্টি অনুভব করে। তারপর তারা ঐ জাতীয় গাছ সন্ধান করতে গিয়ে আখ গাছের সন্ধান পায়। আরো কথিত আছে যে, কালীর ব্যবহৃত ত্রিশূলের বাট আখের কাণ্ডে নির্মিত। সুতরাং বলা যায় যে, আখের উৎপত্তি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার ভারত বিজয় শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় এখান থেকে আখ নিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তর ভারতের সে আখ ছিল খুবই সরু। অতিমিষ্টি কম ছোবড়াযুক্ত অতীব রসালো অভিজাত শ্রেণীর আখের জন্মস্থান প্রশান্ত মহাসগরীয় দ্বীপ নিউগিনিতে। সুতরাং ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ থাকায় প্রথম থেকেই এদেশেও আখচাষের সূচনা ঘটে।

আখ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফসল হওয়ায় এর চাষাবাদ পৃথিবীর ৩০° উত্তর ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ এলাকার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত। আখের সর্বোচ্চ বৃদ্ধিকালীন সময়ে উচ্চ তাপমাত্রা মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস ও প্রচুর সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। পরিপক্ককালীন সময়ে কাণ্ডের অভ্যন্তরে চিনি রূপান্তর ও গাছের বৃদ্ধি মন্থর হওয়ার জন্য নিম্ন তাপ মাত্রার দরকার হয়। আখ গাছ ১৮° সেঃ (৬২°ফা.) থেকে ৩৫° সে. (৯৫° ফা.) তাপমাত্রার মধ্যে সন্তোষজনকভাবে দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করতে পারে। কিন্তু ১৬.৫° সে. (৫৯.৭° ফা.) তাপামাত্রার নিচে বৃদ্ধি হ্রাস পায়। বাংলাদেশের আবহাওয়ার মাসিক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'হিউয়ার্ট (১৯৬৫) মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশের আবহাওয়া আখ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী, যা বিশ্বের আখের সর্বোচ্চ ফলনের অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

ফসল হিসেবে আখ সর্বোচ্চ পরিমাণ সূর্যালোক ব্যবহারের মাধ্যমে শর্করা পরিবর্তন করতে পারে। গম ও ধানের চাইতে আখ ২.৫ গুণ বেশি সূর্যালোক ব্যবহার ও পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। তুলনামূলকভাবে আখ খরা-সহিষ্ণু ফসল। এ জন্য আমাদের বেশিরভাগ আখচাষ বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা এবং দক্ষিণে ফরিদপুর জেলার গঙ্গাবিধৌত স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকায় কেন্দ্রীভূত। তাছাড়া দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে ঝিনাইদহ, যশোর, কুষ্টিয়াতে প্রচুর পরিমাণে আখ উৎপাদিত হয়। এটি ছাড়াও আখের আরো প্রকৃতি রয়েছে। যেমন- স্যাকারাম, সাইন্নেসীম, স্যাকারাম বারটবেরী, স্যাকারাম রোবাসটাস, ও স্যাকারাম সেপনে টেবিনাম। শেষোক্ত দুটি অনাবাদী বন্য প্রকৃতির আখ।

বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে আখ উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আখ উৎপাদনকারী দেশসমূহ হল হাওয়াই, জাভা, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, ভারত ও বাংলাদেশ। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, চীন, পাকিস্তান, ইত্যাদি আখ উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশ ও বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের আখ উৎপাদনের এলাকা ও পরিমাণ সম্বন্ধে নিম্নে ধারণা দেয়া হলো :

সারণি-১ : ১৯৯৪-৯৬ সনে বিশ্বের কয়েকটি নির্ধারিত দেশের আখ উৎপাদনের এলাকা ও হিসাব

দেশের নাম	এলাকা (১০০০ হেক্টরে)			ফলন (টন/হেক্টরে)		
	১৯৯৪-১৯৯৫-১৯৯৬			১৯৯৪-১৯৯৫-১৯৯৬		
ব্রাজিল	৪৩৪৫	৪৫৬৬	৪৮২৬	৬৭.৭	৬৬.৫	৬৭.৭
ভারত	৩৩৯০	৩৭৫০	৩৮৭০	৬৭.০	৬৯.২	৬৫.৯
কিউবা	১১০০	১০৫০	১৫০০	৩৫.৫	৩৪.৩	৩৬.৭
চীন	১১১৩	১১৭৯	১০৪৪	৫৯.৭	৫৯.৬	৫৩.২
থাইল্যান্ড	৮০০	৯৮৫	১০৬৩	৪৭.৩	৫৮.৯	৫৮.৭
পাকিস্তান	৯৬৩	১০০৯	৯৬৩	৪৬.১	৪৬.৭	৪৭.০
মেক্সিকো	৫৪৭	৫৫২	৬১৪	৬৯.১	৭৭.০	৭৬.৬
ইন্দোনেশিয়া	৪৩২	৪০৫	৪০০	৭৯.০	৭৭.৬	৮০.১
ইউএসএ	৩৭৯	৩৭৭	৩৫৯	৭৪.০	৭৪.১	৭৩.৮
ফিলিপাইন	৪০২	২৮৪	৩৬৭	৬৯.৭	৭১.৫	৭০.৮
অস্ট্রেলিয়া	৩৬৬	৩৮৩	৩৯৭	৯৫.৪	৯৮.২	১০২.৪
কলোম্বিয়া	৪২২	৪৩৮	৪৫৬	৭৩.৯	৭৩.১	৭১.২
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৮৪	৩৯১	৪১০	৪০.৪	৫৭.৭	৫৪.৯
আর্জেন্টিনা	২৩৯	২৯৫	২৯৫	৬৪.৯	৫৯.০	৫৯.৭
বাংলাদেশ	১৮১	১৮০	১৭৫	৩৯.৩	৪১.৩	৪১.১
মিশর	১২৬	১২৫	১২৯	১০৯.৩	১১০.৭	১০৯.৫
জাপান	২৫	২৪	২৩	৬৪.৬	৫৭.৩	৭০.০
সারা বিশ্ব	**১৭৬৮৯**	**১৮৩৯৪**	**১৯৪৫৩**	**৬১.৬**	**৬৩.৫**	**৬১.৩**

উৎস : ফাও উৎপাদন বর্ষ-বই (১৯৯০-৯৬) তথ্য ইন্টারনেট থেকে।

৮.০ বাংলাদেশে আখচাষ

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে আখের অবদান নেহায়েত কম নয়। কৃষি অর্থনৈতিক জরীপ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে আখের অবদান ১২-১৫ বিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ-বৎসরে ৬৯.০৯ শত হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদিত হয়েছে এবং জাতীয় মোট উৎপাদনে ১৫.২২ বিলিয়ন টাকা যোগ করে (Rahman. et.al-2003)। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিভিত্তিক শিল্প-ফসলের গুরুত্ব এদেশে অপরিসীম। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এদেশের চিনি ও গুড় শিল্প যা উত্তরাঞ্চলের একমাত্র ভারী শিল্প। তাই উত্তরাঞ্চলের তথা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে ইক্ষুর অবদান

সবচেয়ে বেশি। চিনিকল এলাকায় প্রায় ৬ লক্ষ চাষী পরিবার সরাসরি ইক্ষু চাষের উপর নির্ভরশীল (রহমান ও পাল, ২০০৩)। আখ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল হওয়া সত্ত্বেও এর একর প্রতি গড় ফলন ও চিনি আহরণের শতকরা হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৪ লক্ষ একর জমিতে আখচাষ হয়ে থাকে। যার ২.৩০ লক্ষ একর চিনিকল অঞ্চলে এবং বাকী ১.৭০ লক্ষ একর গুড় উৎপাদনের জন্য সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত। এদেশে আখের একর প্রতি গড় ফলন ১৭ টন এবং চিনি আহরণের শতকরা হার মাত্র ৮ ভাগ। বর্তমানে দেশে ৬৮ লক্ষ টন গুড় উৎপাদিত হয় বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ৬৮ লক্ষ টন আখ থেকে বছরে ১.৭০ লক্ষ টন হতে ২ লক্ষ টন চিনি এবং ৩ লক্ষ টন গুড় উৎপাদিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা বলেন, দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০০ থেকে ৩০০ মে. টন আখ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। অনেক চাষীর জমিতে ২৪৭ মে. টন আখ উৎপাদনের রেকর্ড আছে। অথচ দেশের গড় ফলন মাত্র ৪৩ মে. টন, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম (উদ্দীন, ২০০৫)।

দেশে বর্তমানে ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য ৩ লক্ষ টন চিনি ও ৩ লক্ষ টন গুড় উৎপাদিত হওয়া প্রয়োজন। চিনি ও গুড় উৎপাদনের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার ১৯৯০ সালের মধ্যেই দেশকে চিনি ও গুড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আখ চাষের আওতায় জমির পরিমাণ বাড়িয়ে আখ উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম। উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করলেই উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

সারণি-২ : নন-মিল জোনে আখের আবাদ ও উৎপাদনের পরিসংখ্যান

মৌসুম	আবাদকৃত জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (মেঃ টন)
১৯৯৪-৯৫	০.৮১	২৪.১৬	২৯.৮৩
১৯৯৫-৯৬	০.৭৮	২৮.২৪	৩৬.২১
১৯৯৬-৯৭	০.৮৮	৩৪.২২	৩৮.৮৯
১৯৯৭-৯৮	০.৮০	৩১.৮৮	৩৯.৮৫
১৯৯৮-৯৯	০.৮০	২৮.২৭	*৩৫.৩৪
১৯৯৯-২০০০	০.৮৪	৩৩.৮৩	৪০.২৭
২০০০-২০০১	০.৮৫	৩৪.৩২	৪০.৩৮
২০০১-২০০২	০.৮৫	৩৪.৪৮	৪০.৫৬
২০০২-২০০৩	০.৮৬	৩৫.৩৭	৪১.১৩
২০০৩-২০০৪	০.৮৪	৩৪.৮৬	৪১.৫০

সূত্র : বিবিএস ও ডিএই।

উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চিনি কলগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক সম্প্রসারণ কর্মসূচি, ঋণ সুবিধা, সার ও কীটনাশক, ঔষধ সরবরাহসহ অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা করেও একর প্রতি ফলন আশানুরূপভাবে বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। আখের

ফলন বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় হল জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে চারা না গজানো। রোপণকালের সীমাবদ্ধতা ও জমিতে সুষমভাবে চারার ঘনত্ব না থাকা। এসবের ফলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাড়াইযোগ্য আখ উৎপাদিত হয় না এবং স্বাভাবিকভাবে ফলন কম হয়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১)

চিনিকলের খামারগুলোতে প্রতি বছর ৫০০০-৫৫০০ একর জমিতে নতুন আখ রোপণ করা হয়। আধুনিক চাষাবাদ উপকরণাদি থাকা সত্ত্বেও রোপণ সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে খামারগুলোতে অতি অল্প সময়ে জমি তৈরি, শ্রমিক ও বীজ ও আখ সংগ্রহসহ অন্যান্য রোপণ সামগ্রীর যোগান আর্থিকভাবে দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে জমির রস শুকিয়ে যায়। শীত এসে পড়ে এবং নামলা করে লাগানো আখে চারা গজায় কম এবং ফলনও অনেক কম হয়। অতি আগাম (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) করে কোন রকমে আখ রোপণ করা গেলেও প্রায় প্রতি বছর শেষ মৌসুমের অতিবৃষ্টিতে বীজ দ্রুত পচে যায়। খামারগুলোতে প্রতি বছর ৪০০-৫০০ একর জমির আগাম রোপণকৃত আখ এভাবে নষ্ট হয়ে যায় যা আবার নাবি করে পুনঃরোপণ করতে হয়। ফলে প্রতি বছর খামারগুলোতে ১৮-২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি সাধন হয়। চাষীদের বেলাতেও প্রায় একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। গুড়-অঞ্চলসমূহে ঋণ সুবিধা, কৃষি সম্প্রসারণ, সুস্থ বীজ, আখ সরবরাহ ব্যবস্থা, উন্নত আখের জাত ও উন্নত আখ উৎপাদন প্রযুক্তি এসবের কিছুই না থাকায় আখের ফলন ও আখ চাষাধীন জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ২)।

৯.০ আখ উৎপাদন প্রক্রিয়া

আখ একটি দীর্ঘমেয়াদী ফসল। সারা বৎসর ব্যাপী আখের কোন না কোন প্রকার পরিচর্যা করতে হয়। বাংলাদেশের আখ আবাদের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যথা- প্রচলিত ও রোপা। প্রচলিত বা রোপা যে পদ্ধতিতেই চাষ হোক না কেন, আখ চাষ শুরু করার আগে কতকগুলো বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। "জাত জমি যত্ন তিনে মিলে রত্ন" অন্যান্য ফসলের ন্যায় আখের বেলাতেও কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, জাত-নির্বাচন, আন্তঃপরিচর্যা ইত্যাদি।

৯.১ জমি নির্বাচন

বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধারা আখচাষের জন্য মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা এখানে একটি বিরাট সমস্যা। এক মাসের বেশি বৃষ্টি বা বন্যার পানি দাঁড়িয়ে থাকে এমন জমি আখ চাষের জন্য নির্বাচন না করাই ভাল। দ্রুত বন্যা বা বৃষ্টির পানি নেমে যায় এমন উঁচু বা মাঝারী উঁচু ধরনের জমি আখচাষের জন্য নির্বাচন করা উচিৎ। অবশ্য যেসব চর বা নিচু এলাকায় বন্যার পানি দাঁড়িয়ে থাকে না। কেবলমাত্র বেলে মাটি ছাড়া যেকোন ধরনের মাটিতেই সফলভাবে আখচাষ করা যায়। তবে এঁটেল বা দোঁআশ মাটিই আখ চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। নির্বাচিত জমিটি সমান হতে হবে। তবে একদিকে সামান্য ঢালু হতে হবে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে আখ চাষের জন্য জমি নির্বাচনের মূল বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

জমির অবস্থান : জমিটি অবশ্যই উঁচু বা মাঝারী উঁচু হতে হবে। জমিটি অবশ্যই সমান হতে হবে এবং একদিকে সামান্য ঢালু হলে ভাল হয়। নির্বাচিত জমি অবশ্যই জলাবদ্ধতা মুক্ত হতে হবে। জমির মাটি এঁটেল দোআঁশ বা দোআঁশ প্রকৃতির হলে ভাল হয়।

জমি তৈরি : আখ একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল। তাই ১৮-২০ সেঃ মিঃ গভীর করে আড়াআড়িভাবে ৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি উত্তমরূপে তৈরি করা দরকার। মাটির গভীরে শিকড় প্রবেশ করে যাতে প্রয়োজনীয় রস ও খাদ্য সংগ্রহ ছাড়াও কাণ্ড খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার জন্য ১৫-২০ সেঃ মিঃ গভীর নালায় আখ রোপণ করা প্রয়োজন। তবে বিশেষ অবস্থায় চাষহীন জমিতে সরাসরি নালা করে ও আখের চাষ করা সম্ভব। চাষহীন আগাম আখচাষে জলাবদ্ধতা অঙ্কুরোদগমের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশের যে সমস্ত এলাকাতে গুড় ও চিবিয়ে খাওয়ার জন্য আখ উৎপাদন করা হয় এমন অঞ্চলে সাধারণত এ পদ্ধতিতেই চাষ ছাড়াই বা অল্প চাষেই আখের চারা বা ডগা মূল জমিতে রোপণ করা হয়।

জাত নির্বাচন : অধিক ফলনের জন্য বর্তমানে ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-২১, ঈশ্বরদী-২/৫৪ ও লতারিজবা-সি এ পাঁচটি অনুমোদিত জাতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উঁচু জমির জন্য ঈশ্বরদী-১৬ এবং তুলনামূলকভাবে নিচু এলাকাগুলোতে চাষের জন্য ঈশ্বরদী-২/৫৪, লতারিজবা-সি, ঈশ্বরদী-২০ ও ঈশ্বরদী- ২১ জাত নির্বাচন করা উচিত। গুড়ের গুণাগুণের দিক থেকে সবচাইতে ভাল জাত হলো ঈশ্বরদী-১৬ ও লতারিজবা-সি। যেহেতু গুড় এলাকার আখ চাষীরা একাধিক মুড়ি আখ চাষ করেন সেজন্য এসব এলাকার কৃষকদের জন্য লতারিজবা-সি ও ঈশ্বরদী-২/৫৪ জাত দুটোই সবচেয়ে উপযোগী। অনুমোদিত জাতগুলোর মধ্য থেকে জমির অবস্থা, মাটির প্রকৃতি, আখ রোপণের সময় অংকুরোদগম ক্ষমতা, ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করে উপযুক্ত জাত নির্বাচন করতে হবে (হক-২০০৩)।

বীজআখ সংগ্রহ : উচ্চ ফলনের জন্য শুধুমাত্র ভাল জাত হলেই চলবে না। সেইসাথে রোগমুক্ত এবং প্রত্যায়িত বীজ ক্ষেত থেকে জালী পুষ্ট বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আট থেকে দশ মাস বয়সী সুস্থ ও সতেজ চোখযুক্ত বীজআখ আশানুরূপ অঙ্কুরোদগমের জন্য সবচেয়ে ভাল। বীজআখ অবশ্যই শিকড়মুক্ত হতে হবে। প্রয়োজনে আখের নিচের এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে উপরের দুই-তৃতীয়াংশ বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। বীজআখ সংগ্রহের ৪/৫ সপ্তাহ পূর্বে ক্ষেতে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করে বীজ-আখের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বীজখণ্ড তৈরি ও শোধন : বীজআখ কর্তনের পর পাতা না ছাড়িয়েই পরিবহন করা প্রয়োজন। বীজ রোপণের পূর্বে পাতা ছাড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে অথবা ডেটল দিয়ে জীবাণুমুক্ত ধারালো চাকু/হাসুয়া দিয়ে বীজখণ্ড তৈরি করতে হবে।

বীজতলা তৈরি : প্রয়োজন অনুসারে ১.২৫ প্রস্থবিশিষ্ট যে কোন দৈর্ঘ্যের বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। তবে পরিচর্যা ও চলাচলের সুবিধার্থে ৭.২৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১.২৫ মিঃ প্রস্থ এবং ১৫ সে. মিঃ উচ্চতাবিশিষ্ট বীজতলা তৈরি করা ভাল। বীজতলার মাটি ভালভাবে চাষ

করে শুকিয়ে ও কুপিয়ে ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। প্রতিটি বীজতলার (৭.১৫ মিঃ ও ১.১৫ মিঃ আকারের মাটিতে ৭৫ কেজি পচা গোবর/কম্পোষ্ট/প্রেসমাড) এবং সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে তা ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। উইপোকা ও গোড়ার মাজরা পোকার উপদ্রব থেকে বীজতলার চারা রক্ষা করার জন্য বেড-প্রতি ২০০ গ্রাম রিজেন্ট ও ৩ কেজি আর সম্ভব হলে ০.৫ কেজি ফুরাডান-৫জি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বীজখণ্ড তৈরি ও বীজতলায় স্থাপন : বীজ তলায় লাগানোর জন্য ধারালো হাসুয়া/ছুরি/দায়ের সাহায্যে দু'চোখ, বিশিষ্ট বীজখণ্ড তৈরি করতে হবে। বীজখণ্ডগুলোকে চোখ পাশে রেখে বীজতলায় মাটির সমান্তরালে পাশাপাশি স্থাপন করতে হবে। এরপর বীজখণ্ডগুলো হালকা মাটির স্তর দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে বীজ খন্ডগুলো সামান্য দেখা যায়। এবার বীজতলাটি খণ্ড বা আখের শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা রক্ষার্থে মাঝে মাঝে প্রয়োজন মতো পানি দিতে হবে।

মূল জমিতে চারার ঘনত্ব : মূল জমিতে রোপণকৃত চারার পরিমাণ আখের ফলনের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখে। হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় চারার সংখ্যা নির্ভর করে সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্বের উপর। আর এ দূরত্ব র্নিভর করে রোপণের সময়ের উপর। আগাম চাষের বেলায় এ দূরত্ব নামলা চাষের চেয়ে বেশি হবে।

সারণি-৩ : সারের মাত্রা ও প্রয়োগ ব্যবস্থা (দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য যে মাত্রায় প্রয়োজন)

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল	চিনিকল অঞ্চল	ফলন লক্ষ্যমাত্রা (টন/হেক্টর)	সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)					
			ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	ম্যাগ অক্সাইড	জিংক সালফেড
১. গংগা নদী বিধৌত উচ্চসমভূমি (নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, যাশোর, সাতক্ষিরা, খুলনা, নওগা ও নড়াইল জেলাসমূহ।		১২৫	৩২৫	২৫০	১৮০	১৯০	-	
২. গংগা নদী বিধৌত নিম্ন সমভূমি (নাটোর, পাবনা, গোয়ালনন্দ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, কুষ্টিয়া, নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, মানিকগঞ্জ, ও ঢাকা জেলাসমূহ)		৯০	২৯০	১৭৫	১২০	১৯০	-	

উৎস : ইক্ষুচাষ ঃ হস্তান্তর যোগ্য উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঈশ্বরদী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

- **বেলে মাটির জন্য :** ইক্ষু রোপণের পূর্বে সম্পূর্ণ ফসফেট, জিপসাম, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম এবং এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার নালায় প্রয়োগ করে কোদাল দ্বারা হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার ইক্ষুর কুশি উৎপাদন সময়ে (১২০-১৫০ দিনের মধ্যে) উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া প্রথম উপরি প্রয়োগের এক মাস পরেই দ্বিতীয় দফায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- **এটেল মাটির জন্য :** ইক্ষু রোপণের পূর্বে সম্পূর্ণ ফসফেট, জিপসাম, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার নালায় প্রয়োগ করে কোদাল দ্বারা হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ও পটাশ সার ইক্ষুর কুশি উৎপাদন সময়ে (১২০-১৫০ দিনের মধ্য) উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- **জৈব সার প্রয়োগ :** জমির উর্বরতা ও আখের ফলনশীলতা সংরক্ষণের জন্য হেক্টর প্রতি ১২.৫ টন গোবর/ প্রেসমাড অথবা ৫০০ কেজি খৈল জৈব সার হিসাবে ইক্ষু রোপণের পূর্বেই নালায় প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা : মূল জমিতে ইক্ষু রোপণের পর থেকে আখ কাটা পর্যন্ত আখের জমিতে যে সব কাজ করা হয় তার সবগুলোই অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা হিসেবে পরিচিত। নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

- **মাটি আলগাকরণ ও আগাছা পরিস্কার :** প্রাথমিক অবস্থায় ভারী বৃষ্টিপাতের পর জমিতে জো এলে অবশ্যই মাটি আলগা করে দিতে হবে। মাটির উপরিভাগ শক্ত হলে বাতাস মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে শিকড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। অপর্যাপ্ত শিকড়ের কারণে গাছ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং গাছের বৃদ্ধি বন্ধ বা মন্থর হয়ে আসে। এজন্য আখের বৃদ্ধিকালীন যতবারই ভারী বৃষ্টিপাত হবে অথবা সেচ প্রয়োগ করা হবে জমিতে জো আসার সঙ্গে সঙ্গে তাতোবারই মাটি আলগা করে দিতে হবে। মাটি আলগাকরণের সময় ক্ষেতের আগাছাগুলোও পরিস্কার করতে হবে। ইক্ষু রোপণের পর চার মাস পর্যন্ত অবশ্যই জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- **আখের গোড়ায় মাটি দেয়া :** কুশি বের হওয়া শেষ হলে অর্থাৎ আগাম আখের বেলায় হেক্টর প্রতি ২.০-২.৫ লক্ষ (ঝাড় প্রতি ১২-১৫টি) এবং নামলা আখের বেলায় ১.৫-২.০ লক্ষ (ঝাড় প্রতি ৬-৮টি) কুশি হওয়ার পর আর নতুন কুশি হতে না দিয়ে ঝাড়ের গোড়ায় মাটি দিতে হবে। এর এক মাস পর দ্বিতীয় ও শেষবার মাটি উঠিয়ে দিতে হবে।
- **আখ ঝাড় বাঁধা :** আখ হেলে পড়লে কাণ্ডের বৃদ্ধি মন্থর হয়, পার্শ্বকুশি গজায়, ওজন ও চিনির পরিমাণ কমে যায় এবং কিছু আখ মরেও যায়। আখের কাণ্ড গঠন হওয়ার পর অতিবৃদ্ধি বা ঝড়ো হাওয়ায় গাছ হেলে পড়তে পারে। বাংলাদেশের আবহাওয়া সাধারণত ভাদ্র থেকে কার্তিক (আগষ্ট-অক্টোবর) মাস পর্যন্ত আখ হেলে পড়তে দেখা যায়। আখ হেলে পড়ার আশংকা দেখা দিলেই প্রথমে আখের শুকনো/আধা শুকনো পাতা দিয়ে প্রতিটি ঝাড় আলাদাভাবে বাঁধতে হবে এবং পরে দুই 'সারির তিন অথবা চারটি ঝাড় একত্র করে আড়াআড়ি বাঁধতে হবে। আখ বাঁধার সময় সবুজ পাতা ব্যবহার

করা উচিত নয় এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আখের ডগা যতটা সম্ভব আলাদা থাকে। যথাযথভাবে বাঁধা হলে আখ হেলে পড়লে বীজ আখের গুণাগুণ নষ্ট হয়। হেলে পড়া বীজ আখে পার্শ্বকুশি গজায় ও কাণ্ডে শিকড় গজিয়ে বীজ আখকে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলে। তাই বীজ আখ ক্ষেতে আখ বাঁধা অপরিহার্য।

➢ **সেচ প্রয়োগ ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন** : আখের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে তা আখের ফলনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সেজন্য প্রয়োজনমতো সেচ প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র সেচ প্রয়োগ করেই আখের ফলন ২০-২৫% বৃদ্ধি করা সম্ভব। আগাম আখ চাষের জন্য ০৫টি সেট প্রয়োগ করে আখের ফলন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে আখ রোপণের ১-৭, ৩০-৩৫, ৬০-৬৫, ১২০-১২৫ ও ১৫০-১৫৫ দিন পর যথাক্রমে ৬.০০, ৮.৫০, ১১.০০ এবং ১৩.৫০ সেঃ মিঃ গভীরতায় সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

দীর্ঘ জলাবদ্ধতা আখের ফলনের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। দীর্ঘ জলাবদ্ধতার আশংকা রয়েছে এমন জমিতে আখ চাষ না করাই ভাল। তবে এরূপ জমিতে ইক্ষু চাষ করতে হলে জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত বাছাই করতে হবে এবং জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে (পাল এবং অন্যান্য, ২০০৫, পৃ-৩৯)।

১০.০ তথ্য বিশ্লেষণ

১০.১ উত্তর দাতা সম্পর্কিত তথ্য

দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১৪টি গ্রামের ২৫০ জন আখচাষীর সাক্ষাতকার নেয়া হয়। এ গ্রামগুলো কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার ৩টি উপজেলা তথা কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী ও শৈলকূপার অন্তর্ভুক্ত।

সারণি-৪ : উত্তরদাতা সম্পর্কিত তথ্য

গ্রামের নাম	উত্তর দাতার সংখ্যা	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
বড়ই চারা	৫০ জন	পান্টি	কুমারখালী	কুষ্টিয়া
ঝাউদিয়া	৫০ "	চাঁদপুর	কুমারখালী	ঐ
আবদালপুর	২৫ "	ঝাউদিয়া	কুষ্টিয়া সদর	ঐ
পদমদী	২৫ "	আবদালপুর	ঐ	ঐ
শ্রীরামপুর	০৫ "	ত্রিবেণী	শৈলকূপা	ঝিনাইদহ
বড়দাহ	০৫ "	ঐ	শৈলকূপা	ঐ
মির্জাপুর	০৫ "	মির্জাপুর	ঐ	ঐ
দহকোলা	০৫ "	ঐ	ঐ	ঐ
ঘড়রা	০৫ "	দিগনগর	ঐ	ঐ
খন্দকবাড়ীয়া	০৫ "	ঐ	ঐ	ঐ
কুচুয়া	০৫ "	কাঁচের কোল	ঐ	ঐ
দুধসর	০৫ "	ঐ	ঐ	ঐ
ঝাটই	১০ "	দুধসর ইউনিয়ন	ঐ	ঐ
মঙ্গলবাড়ীয়া	২৫ জন	মঙ্গলবাড়ীয়া	কুষ্টিয়া সদর	ঐ

১০.২ উত্তরদাতা আখচাষীদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

নিম্নের সারণিতে দেখা যাচ্ছে আখচাষীদের বেশির ভাগের বয়স (৪০.৮%) বয়স ৩১-৪০ বছরের মধ্যে। আর সর্বনিম্ন (৮৪%) সংখ্যা দেখা যাচ্ছে ৫১-৬০ বছরের মাঝে। দৈহিকভাবে সমর্থ ও কর্মক্ষম কৃষকেরাই আখ চাষের মত অধিক শ্রমঘন কৃষি কাজের সাথে জড়িত। উপরের চিত্র আমাদেরকে এ ইঙ্গিতই প্রদান করছে।

সারণি-৫ : উত্তরদাতা কৃষকদের বয়স

বৎসর	মিল/এলাকা	মিল বহির্ভূত এলাকা	সর্বমোট	শতকরা হার
২১-৩০	১২ (২৪%)	৪৪ (২২%)	৫৬	২২.৪%
৩১-৪০	২২ (৪৪%)	৮০ (৪০%)	১০২	৪০.৮%
৪১-৫০	১১ (২২%)	৬০ (৩০%)	৭১	২৮.৪%
৫১-৬০	০৫ (১০)	১৬ (৮%)	২১	৮.৪%
সর্বমোট	৫০	২০০	২৫০	১০০%

সারণি-৬ : উত্তরদাতা চাষীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষার স্তর	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত	সর্বমোট	শতকরা
নিরক্ষর	২২ (৪৪%)	৭২ (৩৬%)	৯৪	৩৭.৬%
১ম-৫ম	১১ (২২%)	৪৪ (২২%)	৫৫	২২%
৬ষ্ঠ-৯ম	০৮ (১৬%)	৪০ (২০%)	৪৮	১৯.২%
এস.এস.সি	০৬ (১২%)	১৬ (৮%)	২২	৮.৮%
এইচ.এস.সি	০৩ (৬%)	২৮ (১৪%)	৩১	১২.৪%
সর্বমোট	৫০ (১০০%)	২৫০	২৫০	১০০%

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে আখচাষীদের অনেকেই নিরক্ষর (৩৭.৬%); অপর দিকে এইচ.এস.সি পাশ আখ চাষীদের সংখ্যা ৩১ জন (১২.৪%)।

সারণি-৭ : আখচাষীদের শ্রেণী বিভাগ

শ্রেণী	সংখ্যা			
	ডমল	মিল বহির্ভূত	সর্বমোট	শতকরা হার
ক্ষুদ্র চাষী	১২ (২৪%)	৪৮ (৯৬%)	৬০	২৪%
মাঝারী চাষী	২৬ (৫২%)	১০৪ (৫২%)	১৩০	৫২%
বড় চাষী	১২ (২৪%)	৪৮ (৯৬%)	৬০	২৪%
সর্বমোট	৫০	২০০	২৫০	১০০%

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতাদের বেশির ভাগই মাঝারী চাষী (৫২%)। ক্ষুদ্র চাষী ও বড় চাষীদের সমন্বিত অংকের চেয়েও যা ৪% বেশি।

সারণি-৮ : আখচাষকৃত জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ	উত্তর দাতার সংখ্যা		সর্বমোট	শতকরা হার
	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত		
০০-১.৫ একর	১৮ (৩৬%)	১৬৪	১৮২	৭২.৮%
১.৫১-৩.০০	১৭ (৩৪%)	১২	২৯	১১.৬%
৩.০১-৪.৫০	১৫ (৩০%)	২৪	৩৯	১৫.৬%
সর্বমোট	৫০	২০০	২৫০	১০০%

সারণি-৮ এ দেখা যাচ্ছে মিল এলাকা ও মিল বহির্ভূত এলাকার চাষীদের সর্বমোট ১৮২ জন (৭২.৮%) ১.৫ একর পর্যন্ত জমিতে আখচাষ করে। ৩.০১-৪.৫০ একর পর্যন্ত জমিতে আখ উৎপাদন করে এমন চাষীর সংখ্যা ৩৯ জন (১৫.৬%)।

১০.৩ আখচাষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত

আখচাষীদের অনেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে আখচাষ করছে। জীবনের শুরু থেকেই চাষী দেখে আসছে তাদের পরিবারে এটি চাষ হচ্ছে। চাষীর দাদা আখ চাষ করতেন, বাবা করতেন এবং বর্তমানে তিনি নিজেও তাদের পথ ধরে আখচাষ করছেন। ছোটবেলা থেকেই আখচাষের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন এবং ২০-২২ বছর বয়স থেকেই অধিকাংশ চাষী এককভাবে আখচাষ করে আসছে। আখচাষ সম্বন্ধে তাদের অনেকেরই বেশ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সারণি-৯ : আখবীজের উৎস সম্পর্কে চাষীদের মতামত

উৎস	উত্তর দাতার সংখ্যা		সর্বমোট	শতকরা হার
	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত		
নিজের ক্ষেত	৭ (১৪%)	৮০ (৪০%)	৮৭	৩৪.৮%
নিজ গ্রাম	৬ (১২%)	৬০ (৩০%)	৬৬	২৬.৪%
ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র	২২ (৪৪%)	৪০ (২০%)	৬২	২৪.৮%
প্রদর্শনী প্লট থেকে	১৫ (৩০%)	২০ (১০%)	৩৫	১৪%
সর্বমোট	৫০	২০০	২৫০	১০০%

উপরের চিত্রটি থেকে আমরা এ ধারণা লাভে সক্ষম হচ্ছি যে, ৮৭ জন চাষী (৩৪.৮%) নিজের জমি থেকে আখবীজ সংগ্রহ করে। আবার কিছু চাষী ৬২ জন (২৪.৮%) ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র ও ৩৫ জন্য (১৪%) প্রদর্শনী প্লট থেকে ও বীজ সংগ্রহ করে থাকে।

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতাদের বেশির ভাগই মাঝারী চাষী (৫২%)। ক্ষুদ্র চাষী ও বড় চাষীদের সমন্বিত অংকের চেয়েও যা ৪% বেশি।

সারণি-৮ : আখচাষকৃত জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ	উত্তর দাতার সংখ্যা		সর্বমোট	শতকরা হার
	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত		
০০-১.৫ একর	১৮ (৩৬%)	১৬৪	১৮২	৭২.৮%
১.৫১-৩.০০	১৭ (৩৪%)	১২	২৯	১১.৬%
৩.০১-৪.৫০	১৫ (৩০%)	২৪	৩৯	১৫.৬%
সর্বমোট	৫০	২০০	২৫০	১০০%

সারণি-৮ এ দেখা যাচ্ছে মিল এলাকা ও মিল বহির্ভূত এলাকার চাষীদের সর্বমোট ১৮২ জন (৭২.৮%) ১.৫ একর পর্যন্ত জমিতে আখচাষ করে। ৩.০১-৪.৫০ একর পর্যন্ত জমিতে আখ উৎপাদন করে এমন চাষীর সংখ্যা ৩৯ জন (১৫.৬%)।

১০.৩ আখচাষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত

আখচাষীদের অনেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে আখচাষ করছে। জীবনের শুরু থেকেই চাষী দেখে আসছে তাদের পরিবারে এটি চাষ হচ্ছে। চাষীর দাদা আখ চাষ করতেন, বাবা করতেন এবং বর্তমানে তিনি নিজেও তাদের পথ ধরে আখচাষ করছেন। ছোটবেলা থেকেই আখচাষের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন এবং ২০-২২ বছর বয়স থেকেই অধিকাংশ চাষী এককভাবে আখচাষ করে আসছে। আখচাষ সম্বন্ধে তাদের অনেকেরই বেশ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সারণি-৯ : আখবীজের উৎস সম্পর্কে চাষীদের মতামত

উৎস	উত্তর দাতার সংখ্যা		সর্বমোট	শতকরা হার
	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত		
নিজের ক্ষেত	৭ (১৪%)	৮০ (৪০%)	৮৭	৩৪.৮%
নিজ গ্রাম	৬ (১২%)	৬০ (৩০%)	৬৬	২৬.৪%
ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র	২২ (৪৪%)	৪০ (২০%)	৬২	২৪.৮%
প্রদর্শনী প্লট থেকে	১৫ (৩০%)	২০ (১০%)	৩৫	১৪%
সর্বমোট	৫০	২০০	২৫০	১০০%

উপরের চিত্রটি থেকে আমরা এ ধারণা লাভে সক্ষম হচ্ছি যে, ৮৭ জন চাষী (৩৪.৮%) নিজের জমি থেকে আখবীজ সংগ্রহ করে। আবার কিছু চাষী ৬২ জন (২৪.৮%) ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র ও ৩৫ জন্য (১৪%) প্রদর্শনী প্লট থেকে ও বীজ সংগ্রহ করে থাকে।

সারণি-১০ : আখ চাষে প্রাথমিক পুঁজির উৎস

উৎস	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত এলাকা	শতকরা হার
সঞ্চিত অর্থ	১৫ (৩০%)	১৭৬ (৮৮%)	১৯১ (৭৬.৪%)
ধার	-	১২ (৬%)	১২ (৪.৮%)
গরু বিক্রী	-	০৪ (২%)	০৪ (১.৬%)
স্ত্রীর গহনা বিক্রী	-	০৪ (২%)	০৪ (১.৬%)
ব্যাংক ঋণ	১৫ (৩০%)	০৪ (২%)	১৯ (৭.৬%)
মিল কর্তৃপক্ষ	২০ (৪০%)	-	২০ (৮%)
সর্বমোট	৫০ (১০০%)	২০০ (১০০%)	২৫০ (১০০%)

উপরের টেবিলে আখচাষে প্রাথমিক পুঁজির উৎস চিত্রিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অনেক চাষীর প্রাথমিক পুঁজির উৎস ছিল তাদের সঞ্চিত অর্থ। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন ৭.৬% আখচাষী। স্ত্রীর গহনা বিক্রি করেছেন ১.৬% উত্তরদাতা আর গরু বিক্রি করে পুঁজির সংস্থান করেছেন ১.৬% উত্তরদাতা।

সারণি-১১ : আখচাষের পদ্ধতি সম্পর্কে চাষীদের মতামত

পদ্ধতি	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত এলাকা	সর্বমোট	শতকরা হার
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি	৩৭ (৭৪%)	৪৮ (২৪%)	৮৫	৩৪%
সনাতন পদ্ধতি	১৩ (২৬%)	১৫২ (৭৬%)	১৬৫	৬৬%
সর্বমোট	৫০ (১০০%)	২০০ (১০০%)	২৫০	১০০%

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আখ চাষ করে এমন চাষীর সংখ্যা (৩৪%) খুবই কম। অন্যদিকে সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করে এমন চাষীর সংখ্যা (৬৬%) বেশি। এ থেকে গোটা বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার আদিম অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে। অথচ একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের কোন বিকল্প নেই।

সারণি-১২ : শ্রমিকের মজুরী সম্পর্কে আখচাষীদের মতামত

দৈনিক মজুরী (টাকায়)	আখচাষীর সংখ্যা		আখচাষী	শতকরা হার
	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত লোক		
৫০-৫৫	৩৯ (৭৮%)	১৫৬ (৭৮%)	১৯৫	৭৮%
৫৬-৬০	১১ (২২%)	৪৪ (২২%)	৫৫	২২%
	৫০ (১০০)	২০০ (১০০)	২৫০	১০০%

আখ একটি শ্রমঘন ফসল। কৃষি অর্থনীতিতে অধিক সংখ্যক লোকের কাজের সংস্থান এক্ষেত্রে সম্ভব। এক একর জমিতে আখ চাষ করার জন্য এক বৎসরে ১২০-১৫০ জন শ্রমিকের দরকার হয়। বেকার সমস্যা কবলিত বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক শ্রম নিয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি শ্রমিকের পেছনে আখচাষীদের বেশ মজুরী দিতে হয়।

মিল বহির্ভূত এলাকার ১৫৬ জন (৭৮%) চাষীর মতামত হচ্ছে তারা প্রতি শ্রমিককে দৈনিক ৫০-৫৫ টাকা মজুরী হিসেবে প্রদান করেন। পারিশ্রমিকের হার কম হলেও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির এদেশে কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে আখচাষ এক অতি সহায়ক ফসল।

সারণি-১৩ : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

দুর্যোগের নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা		সর্বমোট	শতকরা হার
	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত এলাকা		
বন্যা	০৭ (১৪%)	২৮ (১৪%)	৩৫	১৪%
খরা	০৩ (৬%)	১২ (৬%)	১৫	৬%
ঝড়	২৫ (৫০%)	১০০ (৫০%)	১২৫	৫০%
জলাবদ্ধতা	১৫ (৩০%)	৬০ (৩০%)	৭৫	৩০%
সর্বমোট	৫০ (১০০%)	২০০ (১০০%)	২৫০	১০০%

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে ঝড় এবং জলবদ্ধতা আখের বেশি ক্ষতি করে যাচ্ছে। তাছাড়া খরা ও বন্যায় ও আখের ক্ষতি হয়। খরা এবং বন্যায় সহিষ্ণু ইক্ষু আবাদ করলে এ ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা হবে না। খরা হলে সেচ দিতে হয় আর জলাবদ্ধতা হলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু ঝড়জনিত সমস্যার ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয় না বলে কৃষকেরা অভিমত দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য কৃষকরা নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করে। ঠিকমত আখের পরিচর্যা করতে হবে, উন্নত চাষাবাদ প্রয়োগ ঘটাতে হবে। বীজ বেশি দিতে হবে এবং আখ মাটির অনেক গভীরে লাগাতে হবে। যথা সময়ে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। আখের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব।

সারণি-১৪ : প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়ে চাষীদের মতামত

	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত এলাকা	মোট	শতকরা
প্রশিক্ষণ নিয়েছেন	৩৪ (৬৮%)	২০ (১০%)	৫৪	২১.৬%
প্রশিক্ষণ নেননি	১৬ (৩২%)	১৮০ (৯০%)	১৯৬	৭৮.৪%
মোট	৫০ (১০০%)	২০০ (১০০%)	২৫০	১০০%

উত্তরদাতা চাষীরা সবাই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীতা মনে করলেও উভয় এলাকা মিলে মাত্র ৫৪ জন (২১.৬%) চাষী আখচাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আখ চাষকে আরো উন্নত করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। সরকারের তরফ থেকে চাষীদের খুব একটা সাহায্য সহযোগিতা করা হয় না। একথা মিল এলাকার বাইরের চাষীদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। জেলা/থানা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইক্ষু চাষীদের কোন ধরনের সাহায্য বা পরামর্শ দেয় না। তুলনামূলকভাবে মিল এলাকার বাইরের চাষীরা এ ব্যাপারে বেশি অবহেলিত।

সারণি-১৫ : আখ বিপণনের ক্ষেত্রে দালাল সমস্যা সম্পর্কে চাষীদের মতামত

মাধ্যম	সংখ্যা		মোট	শতকরা
	মিল এলাকা	মিল বহির্ভূত এলাকা		
দালালের মাধ্যমে বিক্রী	৪০ (৮০%)	৭০ (৩৫%)	১১০	৪৪%
সরাসরি বিক্রী	১০ (২০%)	১৩০ (৬৫%)	১৪০	৫৬%
সর্বমোট	৫০ (১০০%)	২০০ (১০০%)	২৫০	১০০%

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে ১১০ (৪৪%) চাষী দালালের মাধ্যমে উৎপাদিত আখ বিক্রী করে। দালাল সমস্যার কারণে বেশির ভাগ চাষীই আখ ক্রয় কেন্দ্রে আখ বিক্রী করতে অনীহা প্রকাশ করছে। কোন কোন চাষী বলছেন চাষীরাই তাদের প্রয়োজনে দালাল সৃষ্টি করে। অনেক চাষী বলেন পূর্জি কমিটির ফলে দালাল শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কারণ কমিটি চাষী এবং তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। দুর্বল চাষীর কার্ড থাকা সত্ত্বেও আখ বিক্রী করতে পারে না। পূর্জি কমিটি নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের আখ আগে বিক্রী করে বলে বেশির ভাগ উত্তরদাতা জানান। এমতাবস্থায় নিরীহ অনেক চাষীর আখ জমিতেই শুকিয়ে যায়। অনেক কষ্টলব্ধ ফসল যখন চাষী যথাসময়ে বিক্রী করতে ব্যর্থ হয় তখন দালালের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর তার সম্মুখে কোন বিকল্প থাকে না। আর এ সুযোগে দালালেরা কম দামে চাষীদের কাছ থেকে আখ ক্রয় করে।

সারণি-১৬ : নিম্নে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উত্তরদাতাদের মতামত

সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা	সংখ্যা		মোট	শতকরা হার
	মিল এলাকা	মিলের বাহিরের		
সংগঠনের দরকার আছে	৩৮ (৭৬%)	১৮০ (৯০%)	২১৮	৮৭.২%
সংগঠনের দরকার নেই	০৮ (১৬%)	১৬ (৮%)	২৪	৯.৬%
নিরপেক্ষ	০৪ (৮%)	০৪ (২%)	০৮	৩২%
সর্বমোট	৫০	২০০	২৫০	১০০%

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ চাষী ২১৮ জন (৮৭.২%) নিজস্ব সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, নিজস্ব সংগঠন থাকলে তাঁরা নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায় করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে পুঁজির সংস্থান করতে সক্ষম হবেন। ২% চাষী বলেছেন সংগঠন হলে ভাল, না হলে খারাপ নয়। আসলে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকদের নিজস্ব সংগঠন থাকা দরকার। তাহলে তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

১১.০ আখচাষে সমস্যা

আখচাষে বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান। এ সমস্যাগুলোর প্রকৃতি ও মাত্রা বহুমুখী। মিল এলাকার চাষীর সমস্যার সাথে মিলের বাইরের এলাকার চাষীর সমস্যার কোন কোন ক্ষেত্রে

মিল থাকলে ও বিস্তার অমিলও বিদ্যমান। আখ এমন একটি অর্থকরী ফসল যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে চিনিকল কর্তৃপক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং চাষীর। আখচাষীদের আর্থিক অবস্থা ভাল হলে পুনরায় আখচাষে উৎসাহিত হবে। যথাসময়ে আখ সরবরাহ করতে পারলে আখ থেকে চিনি আহরণের পরিমাণ ও বাড়বে অন্যদিকে চাষী ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। আখচাষের বহুবিধ সমস্যাগুলোকে নিম্নোক্ত বিষয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হলো :

১১.১ অর্থনৈতিক সমস্যা

(ক) বাংলাদেশ দরিদ্র বিধায় এদেশের চাষীও দরিদ্র। এখানে জনসংখ্যার তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। অধিকাংশ চাষী বর্গা জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অথচ আখ দীর্ঘমেয়াদী ফসল এবং কাঁচা অবস্থায় গুদামজাত করা যায় না। আখের সুফল ভোগ করতে হলে কমপক্ষে এক বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান দিতে চাষী একটা জমিকে এক বছরের জন্য আটকে রাখতে চায় না। যে কারণে চাষী বর্তমানে অন্য ফসল আবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।

(খ) আখচাষে অধিক ও শক্তিশালী মজুর প্রয়োজন হয় তাই সব মজুরদের মজুরী খাবারসহ ৫০ টাকা এবং খাবার ব্যতীত ৮০ টাকা দিতে হয়। আখ লাগানো থেকে তোলা পর্যন্ত ১ একর জমিতে বছরে প্রায় ২০০-২৪০ জন মজুর লাগে। ফলে আখচাষে বেশি শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন হয়।

(গ) চাষী ট্রাক্টর এবং পাওয়ারটিলার এবং পানি সেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা আর্থিক সংকটের কারণে করতে পারে না। সেই মান্ধাতার আমলের ভোঁতা লাঙ্গল, অর্ধমৃত গরু আর প্রকৃতির উপর নির্ভরতাই চাষীর একমাত্র ভরসা। ফলে আখচাষে ভাল ফলন আসে না।

(ঘ) প্রতি মণ আখ মাত্র ৪০ টাকায় বিক্রী করতে হয়, যা নিতান্তই কম। উৎপাদন খরচের তুলনায় প্রাপ্তি খুবই নগণ্য। প্রতি কেজি আখ মাত্র ১ টাকায় বিক্রী হয় যা অন্য ফসলের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়।

(ঙ) কীটনাশক ঔষধ, বীজ ও সারের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে দরিদ্র চাষী অর্থাভাবে যথা সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঔষধ, বীজ ও সার প্রয়োগ করতে পারে না। এগুলো ব্যবহারের অভাবে আখ দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয় যা থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না।

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা এবং অতিবৃষ্টিতে আখের খুব ক্ষতি হয়। আখ গাছ পড়ে যায়, ভেঙ্গে যায়, জমিতে পানি জমে গাছ মরে যাওয়ার মত অবস্থা হয়। ফলে সময়, শ্রম এবং অর্থের প্রচুর ব্যয় হয়। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে চাষী আখের ঠিকমত যত্ন নিতে পারে না। এতে দীর্ঘমেয়াদী ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

১১.২ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত সমস্যা

(ক) আমাদের দেশের বেশির ভাগ চাষী নিরক্ষর। ফলে তাদের অনেকেই সনাতন পদ্ধতিতে আখ চাষ করে থাকে। তারা প্রকৃতির দয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ফলনবৃদ্ধি এবং উন্নত ধরনের আখ চাষের ক্ষেত্রে এটাই বড় সমস্যা।

(খ) মিল এলাকায় চাষীদের কেউ কেউ আখ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিলেও মিল জোনের বাইরের চাষীদের জন্য ঠিকমত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আবার মিল জোনের মাঠকর্মীরা চাষীদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করেন বিধায় চাষীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দান অনেক সময় সম্ভব হয় না। মিল জোনের বাইরের চাষীগণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে তেমন একটা সাহায্য সহযোগিতা পান না। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে ব্লক সুপারভাইজারদের কর্মকাণ্ড কিছুটা চোখে পড়লেও আখের ব্যাপারে তারা নিষ্ক্রিয়।

(গ) আখ চাষীরা মাঠকর্মীদের কথা অনেক সময় অনুসরণ করে না। কখনও কখনও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও কৃষক সেখানে যায় না এবং যাওয়ার প্রয়োজনও মনে করে না। তাদের অনেকের ধারণা মাঠকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তারা সনাতন প্রথা আঁকড়ে ধরেই আখ চাষ করে থাকে। ফলে ক্ষতিকারক রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা অনুসৃত হচ্ছে না।

১১.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা

(ক) প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এখনও পুরোমাত্রায় ঘটেনি। নদীতে ব্রীজ না থাকায় বিক্রীর জন্য আখ এবং গুড় পরিবহন করা খুবই কষ্টদায়ক ব্যাপার। মিল এলাকায় মিল কর্তৃপক্ষ পরিবহন খরচ দেয় না। চাষীকে বহন খরচ দিয়ে কষ্ট করে কেন্দ্রে নিয়ে যেয়ে আখ বিক্রী করতে হয়। ফলে আখ থেকে গুড় উৎপাদন করলে চাষীর বহন খরচ কম লাগে কারণ মহাজনেরা বাড়ী এসে আখ ক্রয় করে নিয়ে যায়।

(খ) আখ ক্রয় কেন্দ্র থেকে মিলগুলো দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন মিলে আখ পৌছাতে দেরি হয়ে যায়। ফলে আখ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে চিনির পরিমাণ কমে যায়।

১১.৪ ইক্ষু কেন্দ্রের সমস্যা

(ক) মিল তার চাহিদা অনুসারে আখ ক্রয় করে থাকে। কিন্তু চাষী আগাম আখ বিক্রী করতে চায় কিন্তু মিল তা পারে না। ৩/৪ মাস শর্ত অনুসারে পর্যায়ক্রমে আখ ক্রয় করে থাকে যা মেনে নেয়া চাষীর জন্য কষ্টকর।

(খ) অনেক সময় দেখা যায় মিল কার্ডধারী কৃষকের আখ ক্রয় না করে পূর্জি কমিটির চাপ বা কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়কের চাপে কার্যবিহীন চাষীর আখ ও ক্রয় করে থাকে। ফলে কার্ড থাকা সত্ত্বেও অনেক কৃষক আখ বিক্রী করতে পারে না। আবার মিল চলাকালীন অবস্থায় গুড় করলে পুলিশের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ফলে চাষীর কষ্টলব্ধ ফসল জমিতে শুকিয়ে যায় তার কোন কাজে আসে না।

(গ) চাষীর স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য পূর্জি কমিটি গঠন করা হলেও তা চাষীদের স্বার্থের হানি ঘটায়। কমিটির দ্বারা নিরীহ ও সাধারণ চাষীরা শোষণের শিকার হন।

(ঘ) টাকার প্রয়োজনে দরিদ্র চাষী যখন আখ তাড়াতাড়ি বিক্রী করতে পারে না তখনই তাকে দালালের খপ্পরে পড়তে হয়। চাষীর দুর্বলতার সুযোগ নেয় দালালেরা। দালাল চাষীদের লোভ দেখিয়ে কমদামে আখ ক্রয় করে এবং বেশি দামে বিক্রী করে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়কদের সাথে দালালদের যোগসাজস থাকে। চাষীদের ফাঁকি দিয়ে কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়ক ও দালালেরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

(ঙ) রাজনৈতিক চাপ, টেলিফোন, অস্ত্রের মাধ্যমে ভয় দেখানো ইত্যাদি কারণে এবং চাষীর মেয়ের বিয়ে, চাষীর বিবাদ বা মানবিক কারণে এক চাষীকে বেশি সুযোগ দিতে গিয়ে অন্য চাষী হয় ক্ষতিগ্রস্ত। মোট কথা পূর্জি কমিটি সৃষ্ট দালালদের কারণে চাষী অনেক সময় জমিতে আখ রেখে দেয় যা দিনদিন শুকিয়ে গিয়ে ওজন কমে যায় ফলে চাষীর ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। এসব কারণে চাষী আখ চাষ করতে চায় না।

(চ) চাষী কেন্দ্রের আখ পরিমাপ ব্যবস্থা বুঝতে পারেনা আর পরিমাপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণাও দেয়া হয় না। চাষী মনে করে ওজনে ফাঁকি দেয় এবং ওজন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে আখ কেন্দ্রে আখ তছরূপের সুযোগ থাকে।

(ছ) কৃষকদের টাকা ঠিক সময়ে পরিশোধের ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে চাষীকে হয়রানির শিকার হতে হয়। কেন্দ্র থেকে পুরোপুরি টাকা না পাওয়ায় চাষীকে মিল পর্যন্ত পৌছাতে হয়। অনেক সময় টাকা না পেয়েই চাষীকে মিল স্থান ত্যাগ করতে হয়।

১১.৫ মিল ব্যবস্থাপনার সমস্যা

(ক) মিল জোনের বিক্ষিপ্ত অবস্থান এবং জোন এলাকায় শক্তি চালিত মাড়াইকলের যথেচ্ছা ব্যবহার, মিলজোন এলাকায় গুড় উৎপাদন প্রতিযোগিতার ফলে মিল কর্তৃপক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হন। আর এর ফলে চাষীরা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(খ) মিলের অদক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য চাষীরা চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ করেও চিনি গুড় কোনটাই ভোগ করতে পারে না। CDA, CIC-দের দুর্নীতির কারণে বর্তমানে চাষীরা পূর্বের মত পূর্জি প্রতি ৬ কেজি হিসেবে চিনি পাচ্ছে না। তার ফলে বর্তমানে CDA, CIC রা ভাগাভাগি করে নিজেরা চিনি গুড় উঠিয়ে বিক্রী করে দিচ্ছে।

১১.৬ গবেষণা ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা

ক) উন্নত জাতের চিনি সমৃদ্ধ ইক্ষুজাত উদ্ভাবনের অভাব,
খ) উইপোকাসহ অন্যান্য ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের কার্যকর প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে না,
গ) লক্ষ্যভিত্তিক গবেষণা কাজের অপ্রতুলতা,
ঘ) প্রসেস লস বিষয়ক গবেষণা ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাব,
ঙ) পরিমিত সার প্রয়োগ, সেচ ও পানি নিষ্কাশনের অভাব,
চ) অন্যান্য ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশের সাথে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তার অভাব,
ছ) গবেষণা সম্প্রসারণ সংযোগ খুবই দুর্বল।
জ) সার্বিক ফলন বৃদ্ধির সহায়ক অন্যান্য প্রযুক্তি প্রয়োগ ও প্রসার খুবই সীমিত।

১১.৭ সরকারি নীতি সংশ্লিষ্ট সমস্যা

ক) জাতীয় পর্যায়ে আখ চাষের কোন খামার নেই। চিনি কলের ও নিজস্ব খামার ব্যবস্থা নেই। দু'একটি চিনিকলে খামার থাকলেও ব্যবস্থাপনা সংকটের কারণে আখ চাষ না হওয়ায় ভূমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।

খ) জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে মাটি পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে চাষীরা এ ব্যাপারে কোন সাহায্য পাচ্ছে না।

গ) বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এখনও দুর্বল। প্রয়োজনের সময় নদীতে পানি পাওয়া যায় না। নদীগুলো খননের অভাবে বর্তমানে খালে পরিণত হয়েছে। পানি সেচের কোন ব্যবস্থা নেই।

সুতরাং বলা যায় আখ চাষ পদ্ধতি, বিপণন ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। মিল এলাকা এবং মিল জোনের বাইরে উচ্চফলন প্রাপ্তির কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসৃত হচ্ছে না। অথচ মিল এলাকার দায়িত্বে আছে খাদ্য ও চিনি করর্পোরেশন আর মিল জোনের বাইরে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। শুধু কথার মালা দিয়েই কাজ হবে না। বাস্তবে এর কার্যকারিতা থাকা চাই। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার পরিবর্তে আখচাষীরা অনেক সময় হয়রানির শিকার হয়, নির্যাতিত হয়। চাষীর নিজের ফসল বিক্রী করা এবং ভোগ করার কোন সুযোগ নেই। বৃটিশ আমলের নীল চাষের মত এলাকার চাষীরা শোষিত হচ্ছে। চাষীর পরিশ্রমলব্ধ ফসলের উপর তার কোন অধিকার নেই। আইন করে তুলনামূলকভাবে কম দামে মিল কর্তৃপক্ষের কাছে চাষীকে আখ বিক্রী করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ অধিকাংশ চাষী মনে করে মিলে আখ বিক্রী না করে গুড় করলে অধিক লাভ পাওয়া যায়। এতে তাদের আর্থিক অবস্থাও মজবুত হয়।

উপর্যুক্ত সমস্যাবলী সত্ত্বেও বাংলাদেশে আখ চাষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশ চিনি ও গুড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সক্ষম এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য সারা বৎসরব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সৃষ্টি হবে।

১২.০ বাংলাদেশে আখচাষের সম্ভাবনা

আখের ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহারের কারণে এর রয়েছে অপার সম্ভাবনা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর চাহিদা ব্যাপক। খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী ফসলের মধ্যে এটি অন্যতম মূল্যবান ফসল। আখ শুধু চিনি ও গুড় উৎপাদন ছাড়াও নানাবিধ কাজে ব্যবহার হয়। নিম্নে এর বহুমুখী ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হলো :

ক) আখ অধিক পরিমাণে জলাবদ্ধতা, খরা ও বন্যাসহিষ্ণু ফসল। বাংলাদেশের জলবায়ুতে এটি কম ঝুঁকিপূর্ণ অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকায় চাষীদের নগদ আয়ের নির্ভরযোগ্য উৎসই আখ।

খ) আখ প্রধানত দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ) আখের সবুজপাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ) আখের শুকনো পাতা জ্বালানী এবং ঘর ছাউনীতে ব্যবহার হয়।

ঙ) আখের খোসা বা শিকড় এবং ছোবড়া জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চ) গ্রাম অঞ্চলে ছোবড়া তামাকপাতা জ্বাল দিতে ব্যবহার হয়।

ছ) চিনিকলের ছোবড়া কাগজ তৈরিতে ব্যবহার হয়।

জ) চিনিকলের চিটাগুড় গোখাদ্য এবং গ্রাম এলাকায় হোক্কায় ব্যবহার হয়। তাছাড়া বিড়ি সিগারেট শিল্পেও চিটাগুড় মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

ঝ) চিনিকলের প্রেসমাড বা গদ্দা জৈবসার ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়।

ঞ) আখের পচা পাতা শক্তিশালী সার হিসেবে ব্যবহার হয়। সব ধরনের কৃষিকাজের জন্যই এটি উপযোগী।

ট) আখ থেকে স্প্রীট, মদ, ভিনেগার, এলকোহল প্রভৃতি তৈরি হয়।

ঠ) নরম প্রকৃতির কম আঁশযুক্ত রসালো আখ চিবিয়ে খাওয়ার জন্য ব্যবহার হয়। এই চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ খুবই লাভজনক।

ড) দেশের শহর অঞ্চলে ইক্ষুচালিত মাড়াই কল ব্যবহার করে আখের রস বাজারে বিক্রী হয়ে থাকে যা পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা রাখে।

ঢ) গুড় বাংলাদেশের এক ঐতিহ্যবাহী খাদ্যদ্রব্য। শরবত, মিঠাই, পিঠা তৈরি ছাড়াও গ্রাম বাংলায় মিষ্টি দ্রব্য হিসেবে গুড়ের কদর এবং ব্যবহার খুব বেশি।

ণ) শারীরিক এবং পুষ্টিগত দিক থেকে গুড় চিনির চেয়ে বেশি উপযোগী।

ত) গ্রাম অঞ্চলে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে অতিথি আপ্যায়নে গুড় ও মুড়ির প্রচলন খুব দেখা যায়।

থ) আনন্দ, উৎসব, মিলাদ মাহফিল, পূজাপার্বণ, ঈদ উৎসব, বিয়ের অনুষ্ঠান, আত্মীয়তা, আতিথেয়তা, সামাজিকতা, শুভ সংবাদ প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির ব্যবহার এবং প্রচলন রয়েছে যার একমাত্র উৎস আখ।

দ) শহর অঞ্চলে চায়ের প্রচুর ব্যবহার হয়। যার সাথে রয়েছে চিনির গভীর সম্পর্ক।

ধ) বিভিন্ন ভেষজ ঔষধ, আয়ুর্বেদী, ইউনানী ঔষধ শিল্পে আখের ব্যবহার দেখা যায়।

ন) আখের সবুজ পাতা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। সবুজ পাতা থেকে বৎসর ব্যাপী অক্সিজেন পাওয়া যায়।

পৃথিবী জুড়েই আখের ব্যবহার রয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে আখের ব্যবহার যেন ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। বাংলাদেশের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে চিনি এবং গুড়ের ব্যবহার। আখের গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তাই প্রধান অর্থকরী ফসল এবং খাদ্যশস্যের দিক থেকে ধান এবং গমের পরেই আখের স্থান।

বাংলাদেশে যে পরিমাণ আখ উৎপাদিত হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। পুষ্টি বিশ্লেষকদের মতে মানুষের শরীরের খাদ্যবলের ১৩ শতাংশ আসা উচিত গুড় অথবা চিনি হতে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নির্ধারিত মান অনুযায়ী জন প্রতি বার্ষিক ১৩ কেজি চিনি বা ১৭ কেজি গুড় প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশে চিনি ও গুড়ের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ ৬ কেজির ও কম। প্রতিবেশি ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় বার্ষিক মাথাপিছু চিনি ও গুড়ের ব্যবহার যথাক্রমে প্রায় ২১, ১৯ ও ১৩ কেজি। আমাদের চিনিও ঘাটতি মেটানোর জন্য প্রতি বছর ১.৫-১.৭ লক্ষ টন চিনি আমদানী করতে হয়। বিদেশে গুড় পাওয়া যায় না বিধায় দেশে উৎপাদিত গুড় দিয়েই চাহিদা মেটানো হচ্ছে। সুতরাং দেশকে চিনি ও গুড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে প্রয়োজনীয় ৩ লক্ষ টন চিনি ও ৬ লক্ষ টন গুড় উৎপাদনের জন্য ১২০ লক্ষ টন আখ উৎপন্ন করতে হবে। এক কথায় আখের মোট উৎপাদন বর্তমানের প্রায় ৮০ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ১২০ লক্ষ টনে উন্নীত করতে হবে।

আশার কথা হলো অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা দূর করতে পারলে প্রাকৃতিক পরিবেশের সমর্থনে আমাদের চাহিদা মত আখ উৎপাদন সম্ভব। চিনিকলের কৃষিবিদদের মতে অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা দূর করতে পারলে এ অঞ্চলে আখের দ্বিগুণ উৎপাদন সম্ভব। অঞ্চলভেদে প্রয়োজনীয় ইক্ষুর জাত নির্বাচন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি কৃষক আখের চাষ করে তাহলে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি সহজতর হবে। মাঠ পর্যায়ের কৃষি প্রশাসন মিল এলাকার বাইরে এবং চিনিকল কর্তৃপক্ষ মিল এলাকার ভিতরে কৃষকদের উৎপাদন সমস্যা সমাধানের জন্য যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে আখ উৎপাদনে বেশ সুবিধা দেখা দেবে।

খরাসহিষ্ণু হওয়ায় দেশের রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে সেচবিহীন অবস্থায় আখই একমাত্র লাভজনক ফসল। উন্নত চাষাবাদ কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যার ফলন একর প্রতি ২/৩ গুন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উঁচু জমিতে বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায় আউশ ধান ও পাট ফলন ও আয় উভয় দিক থেকেই প্রান্তিক ফসল হওয়ায় ৬ থেকে ৮ লক্ষ একর জমি আখ চাষের আওতায় এনে এবং ফলন ৩০ টনে উন্নীত করে দেশে আরো ২০টি চিনিকল স্থাপন করা সম্ভব। এতে দেশে একদিকে ক্রমবর্ধমান চিনির চাহিদা যেমন পূরণ হবে তেমনি শিল্পে পশ্চাৎপদ এলাকায় গ্রাম ভিত্তিক শিল্প চিনিকল স্থাপন গ্রাম এলাকায় বিপুল কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে চিনি আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

সর্বোপরি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বহুবিধ সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশে আখ উৎপাদনের রয়েছে বেশ সম্ভাবনা। রোপা আখের চাষ যা একটি শ্রম নির্ভর পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক ক্ষেতমজুরদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা কমার কারণে বাংলাদেশের কৃষকরা বর্তমানে অর্থকরী ফসলের যে সংকটে পড়েছে তা থেকে মুক্ত করার জন্য আখই একমাত্র সম্ভাবনাময় ফসল। কারণ আখের বাজার বিদেশর নির্ভর নয়।

১২.০ সুপারিশ ও উপসংহার

বাংলাদেশে যে পরিমাণ আখ উৎপাদিত হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের শরীরের খাদ্য-বলের ১৩ শতাংশ আসা উচিত গুড় বা চিনি হতে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নির্ধারিত মান অনুযায়ী জন প্রতি বার্ষিক ১৩ কেজি

চিনি বা ১৭ কেজি গুড় প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশে চিনি ও গুড়ের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ ৬ কেজি। চিনির ঘাটতি মেটানোর জন্য প্রতি বছর ১.৭ লক্ষ টন চিনি আমদানী করতে হচ্ছে। আর গুড় আমদানী করা যায় না বিধায় গুড়ের ঘাটতি রয়েই গেছে। যা মিটানো হচ্ছে চিনি দিয়ে। অতি মিষ্টি জাতের আখের সফল চাষের জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটি অত্যন্ত উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও আখের চাষ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। এর জন্য বিভিন্ন সমস্যা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। এই সমস্যাগুলোকে দূর করে যদি আখ চাষ বাড়ানো যায় তাহলে বাংলাদেশ চিনি ও গুড়-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং আখ চাষের জন্য অনুমোদিত ও বিদ্যমান কলাকৌশলসমূহ সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ পরিমাণ-মত ব্যবহার করা যায় তাহলে বর্তমান গড় ফলনের মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে।

তাই আখ চাষের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং আখের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার ব্যবস্থার সংস্কার এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং কলা-কৌশল ব্যবহারের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো :

১৩.১ সুপারিশসমূহ

১) আখের মূল্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সমপর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে। গুড়ের মূল্য এবং কাঁচা আখের দামের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

২) ইক্ষু উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কর্মীদের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অধীনে ন্যস্তকরণ।

৩) উন্নতমানের চিনি সমৃদ্ধ ইক্ষুজাত উদ্ভাবন করতে হবে।

৪) সাধারণ কৃষকদের মত আখ চাষীদের ঋণ মওকুফ করতে হবে।

৫) আখ চাষীদের দুর্ভোগ লাঘব করার লক্ষ্যে মাড়াই মৌসুম এ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে।

৬) চিনিকলে সরবরাহকৃত আখের মূল্য চাষীদের সাথে সাথে পরিশোধের ব্যবস্থা করা।

৭) অধিক ফলনশীল ইক্ষুজাত এবং রোগমুক্ত ইক্ষু বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮) ইক্ষু ক্রয়কেন্দ্রের ওজন পদ্ধতি সম্পর্কে চাষীদের ভালভাবে ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরন, চাষী বুঝতে পারে এমন পদ্ধতির মাধ্যমে আখ পরিমাপের ব্যবস্থা করা।

৯) দালাল এবং পূর্জি কমিটিকে ক্রয় কেন্দ্র থেকে নির্মূল করা এবং দালালদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া। চাষী যাতে দালালদের স্মরণাপন্ন না হয় সে জন্য চাষীর সুবিধামত সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া।

১০) CIC, CDA-দের পাশাপাশি চাষীদের ইক্ষুচাষ পদ্ধতি, উন্নতজাত, পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চাষ, পরিমিত সার প্রয়োগ, পানি সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১) ইক্ষু জমি হতে ক্রয় কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য চাষীদের পরিবহন খরচ প্রদান এবং মিল এলাকায় চাষীদের প্রয়োজন মত গুড় করার সুযোগ দেওয়া।

১২) উই পোকাসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনের কার্যকর প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা।

১৩) চিনিকল বহির্ভূত এলাকায় পর্যাপ্ত ইক্ষুর আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে গুড়কে একটি শক্তিশালী গ্রামীণ শিল্প হিসেবে গড়ে তেলার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৪) আখ দীর্ঘমেয়াদী ফসলের কারণে এর সাথে সাথীফসল আবাদ করে দারিদ্র্য পীড়িত চাষীরা অতিরিক্ত একটি ফসল ফলিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। তাই চাষীদেরকে সাথী ফসল আবাদে উৎসাহী ও পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

১৫) উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বি, এস, আর, আই থেকে অধিক সংখ্যক প্রচার পত্র, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রদর্শনী স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। সমগ্র মিলজোন ও গুড়জোনের চাহিদা নিরূপণ করে প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।

১৬) আখের চিনি আহরণ হার বৃদ্ধির জন্য মুড়ি আখের চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। মুড়ি আখ চাষের বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ দূর করতে হবে।

১৭) দেশব্যাপী গবেষণার স্বার্থে বি, এস, আর, আই এর প্রধান কেন্দ্র, আঞ্চলিক ও উপ-কেন্দ্র সমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে জনবল বৃদ্ধি এবং আধুনিক গবেষণা পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাতে গবেষণা বাজেট বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।

১৮) ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মরিসাস, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের ইক্ষু গবেষণা ইনিস্টিটিউটের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রযুক্তি উন্নয়ন, জার্নাল বিনিময় এবং উন্নত ক্লোন আমদানী দ্বারা জমি প্লাজম ব্যাংক সমৃদ্ধ করতে হবে।

১৯) উচ্চ চিনি আহরণ হার সম্পন্ন ও প্রতিকূল অবস্থা সহিষ্ণু ইক্ষুজাত উদ্ভাবন, সমন্বিত পোকামাকড় ও রোগ বালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা, উচ্চ আখ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার প্রযুক্তি ও সাথীফসল চাষের উন্নত কলা-কৌশল উদ্ভাবনে সামগ্রিক গবেষণা কর্মসূচি জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মসূচি জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের আরো তৎপর ও নিবেদিত হতে হবে।

২০) বিদেশ থেকে চিনি আমদানী ছাড়াও চোরাই পথে ভারতীয় চিনি বন্ধ করে চিনি শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারের সুষ্ঠু নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

২১) সামগ্রিক ইক্ষু গবেষণা ও উৎপাদন কর্মসূচি জোরদার করার লক্ষ্যে আগামী ১০ বছরের জন্য একটি একশন প্ল্যান তৈরি করে ইক্ষুর ফলন আগামী পাঁচ বছরে হেক্টর প্রতি অবশ্যই ৮০ টনে উন্নীত করার ব্যবস্থা করা।

২২) আখ চাষীদের নিজস্ব সংগঠন থাকা দরকার যার মাধ্যমে তারা তাদের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে।

১৩.২ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আমদের মাতৃভূমি সুজলা, সুফলা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাংগেয় ব-দ্বীপ এলাকা হওয়ায় এদেশ কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযোগী। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র সোপান হচ্ছে কৃষি। অথচ অর্থনীতির নিয়ন্তা কৃষকের বর্তমান অবস্থা খুবই করুণ। বিশেষ করে ইক্ষুচাষীদের অবস্থা সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। ইক্ষু দীর্ঘমেয়াদী এবং অতিরিক্ত শ্রমসাপেক্ষ ফসল হওয়ায় এর উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া উৎপাদিত ফসলের বিপণন ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ার দরুন একাধিক সমস্যার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে এই অর্থকরী ফসলটি। এই গবেষণায় এ বিষয়টি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ইক্ষুচাষীদের কঙ্কালসার দেহে শক্তি নেই, ঘরে অর্থ নেই। প্রয়োজনীয় মূলধন নেই, উন্নত কৃষি পদ্ধতির সাথে নিরক্ষর চাষী অপরিচিত, বিশেষ করে মিল-জোনের বাইরের এলাকার চাষীদের আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ও আশানুরূপ হচ্ছে না। তারপরও চাষী অনেক কষ্ট করে ইক্ষু উৎপাদন করা সত্ত্বেও বিপণন ব্যবস্থার জটিলতার কারণে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের সকলের উচিত ইক্ষুর মত অর্থকরী, লাভজনক ও শ্রমঘন ফসলকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইক্ষুচাষীদের দিকে সুনজর দেয়া।

তথ্য সূত্র

Rahman, Dr. ABM Mafijur et.al, : Introducting Bangladesh Sugarcane Research Institute, Bangladesh Sugarcane Research Institute, (2003) p-26.

আলী, মো ঃ ইয়াসিন. : চিনি ও গুড়ে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে বাংলাদেশে আখ চাষের প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা, পৃষ্ঠা নং-১ ।

ইসলাম, মুহাম্মদ সিরাজুল : আখচাষের সহজ কথা, পৃষ্ঠা- ১ ।

উদ্দীন, কৃষিবিদ মোঃ জালাল (২০০৫). : আখের জাত জমি নির্বাচন ও রোপণ পদ্ধতি, কৃষিকথা, খামার বাড়ী, ঢাকা- পৃ- ১ ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (১৯৯২). : আখ চাষ ও গুড় উৎপাদন নির্দেশিকা, ফার্মগেট, ঢাকা- পৃ-৩ ।

মফিজুর রহমান ও অন্যান্যরা সম্পাদিত প্রকাশনা নং- ৭৪ সেপ্টেম্বর' ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১২

রহমান, এস, এম, হাবিবুর ও এম এ সাত্তার (১৯৯৯). : "আখ চাষ ও গুড় উৎপাদন নির্দেশিকা", বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, পৃষ্ঠা নং- ৮৮ ।

রহমান, ড. এ.বি.এম মফিজুর ও ড. সমজিত কুমার পাল (২০০৩). : বাংলাদেশে ইক্ষু উৎপাদন প্রযুক্তি ঃ একটি হ্যান্ডবুক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা, পৃ-৫ ।

সাত্তার, মোহাম্মদ আব্দুস (২০০৫). : নন মিলজোন আখ চাষ জোরদারকরণ প্রকল্পের ভূমিকা ও আখ চাষের গুরুত্ব, কৃষি কথা, আখ সংখ্যা, খামারবাড়ী, ঢাকা- পৃ-২৫৯ ।

হক, মোঃ মহিবুবুল (২০০৩). : আখ চিনি ও গুড় নিয়ে যতকথা, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭, পৃ-৫৭ ।

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
একত্রিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৪/জ্যৈষ্ঠ ১৪১১

BOOK REVIEW

Name of the Book: Accountability in Public Management and Administration in Bangladesh

Dr. Md. Mafizur Rahman*

In a democratic society people are supposed to be the source of all power. Ensuring public accountability is a real and practical task of democracy. Although Westminster style of parliamentary democracy has been adopted from 1991 in Bangladesh, accountability is yet to be established in the country. This is mainly because of weak democratic practice in political parties and parliament, excesive dependence on bureaucracy, corruption, lack of knowledge and transparency. Dependence on civil bureaucrats is an inescapable feature of Bangladesh democracy. The people no longer believe that the politicians are honest, democratically inclined and accountable to the people. A democratic government turn into autocratic, elected politicians becomes authoritarian and government machineries become an instrument for repression due to lack of accountability. An accountable government and performance oriented neutral civil service is essential for establishing parliamentary democracy. It is urgent to have consensus between treasury bench and opposition to ensure democratic culture and protection of judicial independence to ensure accountability in public management and administration.

Talib A. Younis and Iqbal MD. Mostafa in their book "*Accountability in Public Management and Administration in Bangladesh*" pointed out that accountability in public management is important to establish democracy, economic development and human rights. Both performance and transparency of organizational units and individual civil servants are important indicators of accountability. Persons who exercise public authority, whether politicians or civil bureaucrats, should be held accountable for exercising of that authority. Accountability at political leadership indicates responsiveness to the people who voted them into political power and accountability of public officials as the citizens are paying for them.

* Director (Deputy Secretary), BPATC, Savar, Dhaka